অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। বিচিত্র রাজনীতি - হেথায় হোথায় ।।

১.

২০১০ সালের ২৩ জুন অস্ট্রেলিয়াসহ সারা পৃথিবীর মানুষ অবলোকন করলো একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর মেয়াদ শেষ হবার আগেই অনেকটা সংসদীয় ক্যু-র মাধ্যমে দশ মিনিটের মাথায় কী করে অপসারণ করা হলো রাজধানী ক্যানবেরায় ফেডারেল সংসদ ভবনে। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কেভিন রাড এম.পি যিনি ডুবন্ত লেবার পার্টিকে উদ্ধার করে ক্ষমতার মসনদে বসিয়েছিলেন এবং সত্যি বলতে তখন এই কেভিন রাডই ছিলেন লেবারের একমাত্র ভরসা - তো, সেই কেভিন রাডকে তাঁর নিজ দলের মানুষরাই হটিয়ে উপ-প্রধানমন্ত্রী জুলিয়া গিলার্ড এম.পিকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিলেন। এর ঠিক তিন বছর তিন দিন পর অর্থাৎ গত ২৬ জুন অস্ট্রেলিয়াসহ সারা পৃথিবীর মানুষ অবলোকন করলো একই ঘটনার পুনঃরাবৃত্তি। যিনি বেরিয়েছিলেন তিনি ফিরে এলেন এবং যিনি ছিলেন তিনি বেরিয়ে গেলেন (প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটার কথা মনে পড়ছে - " ভালোবাসা আসবে বলে খুলে দিলাম দরজাটাকে/মন থেকে সুখ যে আমার পালিয়ে গেলো সেই ফাঁকে/এ গেলো তো ও এলো, ও এলো তো এ গেলো/ এক সাথে পেলাম না আর একই সাথে দু'জনাকে)। যে দুঃখ গ্লানি অপমান আর ক্ষোভের বোঝা নিয়ে সেদিন কেভিন রাড চলে গেলেন তিন বছর তিন দিন পর সেই একই দুঃখ গ্লানি অপমান ক্ষোভের বোঝা নিয়ে জুলিয়া গিলার্ড বেরিয়ে গেলেন। সারা বিশ্ব দেখলো দুই নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কিভাবে সংসদীয় ক্যু-র মধ্যে দিয়ে রাজনীতির খেলায় পরাজিত হলেন।

এ খেলার সবচে' মজার এবং লক্ষণীয় বিষয়টি হলো এই দু' দুটো রাজনৈতিক খেলার মূল খেলোয়াড় বা কারিগরদের হোতা কিন্তু একই ব্যক্তি। তিনি হলেন বিল শর্টেন এম.পি - দেশের বর্তমান গভর্ণর জেনারেল কুইনটিন ব্রাইসের জামাতা। লেবার দলের সবচে বড় শক্তি হলো ইউনিয়ন এবং সেই ইউনিয়নের নেতৃত্ব দেন বিল শর্টেন যে কারণে তিনি পাওয়ার ব্রোকার হিসেবে সবখানেই কদর পান। কেভিন রাডের প্রথমবার প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে এই ইউনিয়ন লিডারের সাথে খুব একটা ভালো সময় যাচ্ছিলো না তাঁর। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী কেভিন রাড কোন দলীয় নেতাকেই তেমন সমীহ করে চলতেন না (যেটা সবারই জানা এবং দ্বিতীয়বারে তাঁর উত্থানে সবার সেই একই জিজ্ঞাসা - রাড কী একটুও বদলেছে?) তাই তাঁর অধিকাংশ একক সিদ্ধান্তের কারণে ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিলো আশপাশের সকলেই। সুযোগটা নিলেন উচ্চাভিলাষী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঝানু রাজনীতিবিদ বিল শর্টেন। তাঁর লক্ষ্য চূড়ায় ওঠা। কেভিন রাডের জনপ্রিয়তাকে হয়তো তাঁর ভয় অথবা হয়তো সেই বিপুল জনপ্রিয়তাকে টপকাতে বহু দিন অপেক্ষা করতে হতে পারে। তাই ঝোপ বুঝে দিলেন কোপ। কেভিন রাডের একান্ত বিশ্বস্ত উপ-প্রধানমন্ত্রী জুলিয়া গিলার্ডকে স্বপ্ন দেখালেন - আপনি হতে পারেন একটি ইতিহাস - দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। আপনি কেবল রাজি থাকুন কাজ আমরা করবো। দেশকে বাঁচাতে হবে দলকে বাঁচাতে হবে। ক্ষমতার মোহের কাছে সময়ে বিবেক হয় পরাজিত। এবং তাই হলো। উপ-প্রধানমন্ত্রী জুলিয়া গিলার্ড হলেন দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। এরপর নির্বাচন দিলেন।

জিতলেনও। কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত (সঠিক অথবা বেঠিক বলা মুশকিল) যেমন কার্বন ট্যাক্স, মাইন ট্যাক্স, ৪৫৭ ভিসাসহ (স্পন্সরড স্কীলড মাইগ্রেশনভিসা) আরো কিছু সিদ্ধান্ত দলকে পঁচাতে শুরু করলো। জনমত যাচাইয়ে আগামী নির্বাচনে জয়ের পারদ ক্রমশঃ নামতে শুরু করলো। লেবার দলের রাজনীতিবিদদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়লো। এবার লেবার হারলে আগামী দু'তিন দফায় আর ক্ষমতায় আসা যাবে না বলে তাঁদের অনেকের ধারণা। অতএব নেতৃত্বে পরিবর্তন আনতে হবে। প্রধানমন্ত্রী জুলিয়া গিলার্ড তা মানতে রাজী নন। বললেন নির্বাচনের আগে এমন বহু পারদ উঠানামা করে এবং করবে কিন্তু ভোটাররা দিনশেষে ঠিকই আমাদের জয়যুক্ত করবে। ওদিকে যাঁরা ক্ষমতার চাইতে দলকে এবং দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশী ভাবেন তাঁরা দেখছেন দলের ভরাডুবি। নেতৃত্বে পরিবর্তন না আনলে এ ভরাডুবি থেকে কোন উদ্ধারের পথ নেই। আর সে ক্ষেত্রে একমাত্র পছন্দ কেভিন রাড। ইতোমধ্যে কেভিন রাড একবার ভুল হিসাবনিকাশের জেরে নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করে ঠকেছেন অতএব এবার আর সহজে ও পথ মাড়াচ্ছেন না। তিনি এবার পুরোপুরি নিশ্চয়তা চান। ওদিকে বিল শর্টেন ভাবছেন এবার যদি লেবার ক্ষমতায় না আসে তবে আগামী এক দশকে আর লেবার ক্ষমতায় নাও আসতে পারে। ফলে আমাকে আগামী প্রধানমন্ত্রীত্বের আশা করতে হলে আগে লেবারকে বাঁচাতে হবে। আমার পিছনে যে ককাস ভোটের শক্তি তা দিয়ে যদি আমি কেভিন রাডকে নিশ্চিত করতে পারি আপনি চ্যালেঞ্জ করুন আমি সমর্থন দেবো তবে নিশ্চয়ই তিনি রাজি হবেন। পরবর্তীতে আমি যখন দলের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রীত্বের জন্য লড়বো তখন আপনার সহযোগিতা সমর্থন আমাকে দিতে হবে। এমনই নাকি একটা সমঝোতা। কেভিন রাড যখন বিল শর্টেনের কাছ থেকে নিশ্চয়তা পেলেন তখনই রাজি হলেন যদিও বিল শর্টেন প্রকাশ্যে সমর্থন দেখালেন ককাস ব্যালটের মাত্র কুড়ি মিনিট আগে। তাই আগামীর প্রধানমন্ত্রী বিল শর্টেন এভাবেই নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন আর খেলছেন রাজনীতির খেলা। প্রথমবারের খেলোয়াড় তিনি - দ্বিতীয়বারেও সেই তিনি। তবে প্রথম সংসদীয় ক্যু দ্বিতীয়টির পথ সুগম করেছে পাশাপাশি ভোটারদের করেছে গনতন্ত্রের প্রতি আস্থাহীন। পর পর এ দুটি সংসদীয় ক্যু এদেশের মত এমন স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক দেশের জন্য কালিমা এবং এর কোনটিই আশাব্যঞ্জক নয়। অস্ট্রেলিয়ার মত দেশে একেবারেই বেমানান। সময়ই বলবে এভাবে পাওয়ার ব্রোকারদের হাতে গনতন্ত্র এবং রাষ্ট্রের মান-সম্মান কতখানি নিরাপদ। জনগণ যাদেরকে ভোট দিচ্ছে তারা ক্ষমতায় থাকতে পারছে না তারা জনগনের সেবক হতে পারছে না। কর্তাদের ইচ্ছাতেই চলছে সকল কর্ম। জনগণই ক্ষমতার উৎস এ বচন কী আজ আর সত্য? হলো কই?

যে আশায় দল বাঁচাতে কেভিন রাডকে আনা হলো সে আশা কী শেষমেষ পূরণ হবে? লেবার কী ভোটারের ভগ্নহৃদয় জয়ে সক্ষম হবে? হবে কী কেভিন রাডের আশাপূর্ণ? হবে কী বিল শর্টেনর আশাপূর্ণ? সময়েই সব জানা যাবে। কত যে বিচিত্র এই রাজনীতি।

২.

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চার সিটি কর্পরেশনের নির্বাচন এবং সে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ১৪ দলীয় বাম নিয়ন্ত্রিত সরকারের ভরাডুবি নাড়া দিয়েছে সকল জোটে। বিরোধী দলীয় জোট ভাবছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি কায়েম করে যদি জাতীয় নির্বাচনটি করা যায় তবে জয় অনিবার্য। দেশের মানুষ তাদের ক্ষমতাসীন করতে প্রস্তুত হয়ে আছে। কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। এ কারণেই নয় যে, একটি প্রচলিত কথা আছে - "আওয়ামী লীগ খেলে ভালো কিন্তু গোল খায়।" পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে কথাটি একেবারে মিথ্যে নয়। পঁচাত্তর পরবর্তী আওয়ামী লীগ শাসন আমলে শ্রেষ্ঠ এবং

উল্লেখযোগ্য অনেক কাজ হবার পরেও আওয়ামী লীগ তার ফসল ঠিকমত ঘরে তুলতে পারেনি। এবার যে এতো বিশাল ব্যবধানে জয় লাভ করে ক্ষমতায় চার বছরের অধিক সময় কাটিয়ে দিলো তাও সম্ভব হয়েছিলো পূর্ববর্তী সরকারের প্রতি ভোটারদের নেতিবাচক মনোভাবের কারণে। যদিও বাংলাদেশে সাধারণ নিয়মে একই সরকারকে পর পর দুবার দেখা যায় না - যে টুকু দেখা গেছে তার পেছনে কিছু "চুদুর-বুদুর" (এটাই নাকি এখন সংসদীয় ভাষা) টাইপের ঘটনা আছে। এবারই প্রথম একটা অপার সম্ভাবনা ছিলো ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বর্তমান সরকারকে দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় রাখার। তাও বুঝি ফসকে যাচ্ছে। সদ্য সমাপ্ত সিটি করপোরেশনের নির্বাচন দেখে অনেকে তাই ধারণা করছেন। এ সরকার এবারে অনেক প্রশংসনীয় কাজ করেছে বিশেষ করে শিক্ষা, কৃষি, যোগাযোগ, চিকিৎসা, মিডিয়া সেক্টরে। এসব ছাড়িয়ে সবচে' শ্রেষ্ঠ কাজটি হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। অন্তত এই একটি কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে এ সরকারের পিছনে আছি যদিও "লা-জবাব" হয়ে গেছি এদের কিছু কায় কারবারে। যেমন - হলমার্ক, ডিসটিনি দূর্নীতি, সাগর-রুনী হত্যায় সরকারের সুচতুর লুকোচুরি, পদ্মাসেতু নিয়ে "ছ্যালকুতকুত" খেলা এবং কালো বিড়ালখ্যাত সুরঞ্জিত সেনের ঘুষ কেলেংকারী ধামা চাপা দেয়া। কাদের এবং কিসের স্বার্থে হলমার্ক, ডিসটিনি দূর্নীতির সুরাহা হলো না? এতো লোকবল কৌশল থাকতে সাগর-রুনীর হত্যার বিচার কেন করা যাচ্ছে না? এক আবুল হোসেনকে বাঁচাতে গিয়ে কেন আমরা পদ্মাসেতুর জন্য বিশ্বব্যাংকের সহায়তা হারালাম? আবুল হেসেনের কাছে কার এবং কিসের দায়বদ্ধতা? পৃথিবীর কোথাও কী আছে বছরের পর বছর একজন দপ্তরহীন মন্ত্রী? সাধারনতঃ কোন মন্ত্রী বা উচ্চপর্যায়ের কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উঠলে তদন্তের স্বার্থে তাকে সাময়িকভাবে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রাখা হয় আর কালো বিড়ালবাবুর ঘুষ কেলেংকারী হাতেনাতে ধরা পড়ার পরও তিনি মন্ত্রী(!) এবং কোন কাজ ও দায়িত্বপালন না করেই মন্ত্রীর বেতন ভাতা সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন। বড়ই বিচিত্র এই রাজনীতি। প্রফেসর ইউনূস যতই সুবিধাবাদী হোন তাঁকে সাথে নিয়ে কী কাজ করা যেতো না? আবুল হোসেন আর সুরঞ্জিত সেনকে যদি সহ্য করা যায় প্রফেসার ইউনূসকে কেন সহ্য করা যাবে না?

সমস্ত ভালো কাজ গুলো আড়াল হয়ে যাচ্ছে এসব অ-কাজ গুলোর অন্তরালে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অনেকেই এখন সন্দেহের চোখে দেখে সরকারকে যে তলে তলে তারা হেফাজত-জামাতের সাথে গোপন আঁতাতের চেষ্টায় লিপ্ত যাতে বিএনপি-র কাছ থেকে ওদেরকে আলাদা করা যায়। তাইতো গোলাম আযমের বিচারের রায় ধরে রাখা হয়েছে, নিজামী, সাকার বিচারকার্জ চলছে ঢিমা-তেতালায়। ওদিকে এরশাদকে নিয়ে চলছে "দড়ি-টানাটানি"। ভাগ্য বটে এরশাদের। তার জনপ্রিয়তা কেবল পা-চাটাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আছে ক্ষমতালোভীদের মধ্যেও। এমনই নর তিনি যে তাঁকে সবারই প্রয়োজন।

একটা ছোট্ট গল্প বলি। এক সংসারে মা, ছেলে এবং ছেলের বউ। তো একদিন দুপুরে মাঠে খুব খাটাখাটুনীর পর ছেলে বাড়ীতে খেতে এসেছে। খাটুনীর কারণে মেজাজ তার খুব চড়া। খেতে বসে তরকারীর চেহারা দেখে তার পছন্দ হয়নি। ভেবেছে মা বুঝি রেঁধেছে। খিদের চোটে যদিও খাচ্ছে তবু চিৎকার করে মাকে জিজ্ঞেস করছে মা, মা এ তরকারী কে রেঁধেছে ? তুমি? মা বলছে না বাবা বউমা-ই তো রেঁধেছে কেন কোন সমস্যা হয়েছে ? বউ রেঁধেছে শুনে এবার তো ছেলের গলার স্বর বদলে গেছে। ছেলে বলছে - ও তাই বলো- না মানে দেখতে খারাপ হয়েছে কিন্তু খেতে ভালো। চার সিটি করপোরেশনে হেরে এখন ১৪ দলীয় বাম নিয়ন্ত্রিত দলের লোকজনও তেমনি করে বলছে নির্বাচনে যদিও হেরেছি কিন্তু কাজটা খুব ভালো হয়েছে। একেবারে শতভাগ নিরপেক্ষ যাকে বলে। এমনি

করেই তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া জাতীয় নির্বাচন আমরা করতে পারবো। আর এসব বলছে কারা? ঘুরে ফিরে ওই হঠাৎ উদিত মাহবুবুল আলম হানিফ (যাঁর আবির্ভাবের আগে কোনদিন ছাত্র নেতা বা দলীয় নেতা হিসেবে নামই শুনিনি), মোহাম্মদ নাসিম আর নয়তো জাসদ থেকে আসা তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, বাম ধারার রাশেদ খান মেনন, নূরুল ইসলাম নাহিদ, দিলীপ বড়ুয়ারা। মতিয়া চৌধুরী তো আগে থেকেই আছেন। কোথায় গেলো দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম? তেমন করে দেখিনা কেন তোফায়েল আহম্মদ, আমির হেসেন আমুসহ আওয়ামী লীগের সেই হেভিওয়েটদের? বাম দিক থেকে আসা যারা এখন সরকারকে ঘিরে আছেন এরা নিজেরা নৌকায় চড়া ছাড়া কত জন কবে এমপি হয়েছেন? অতীতে এঁরা কতটুকু শান্তিতে থাকতে দিয়েছেন এই সরাকারের দলকে?। সবাই বিশেষ করে হাইকমান্ডরা কী সব ভুলে গেছেন? না জেগে ঘুমাচ্ছেন? ২৩ জুন ছিলো আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এদিন দলের মূল অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ছিলেন বাম ঘরাণার নূহ-আলম লেনিন। কারণ তিনি এখন আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক (কী দূর্ভাগ্য আওয়ামী লীগ নিজের ঘরের কাওকে খুঁজে পায়নি)। আওয়ামী লীগ যেদিন এই লেলিনকে প্রচার সম্পাদক করলো সেদিন তোফায়েল আহমদ দুঃখ করে বলেছিলেন - এখন আমাদের এই নূহ-আলম লেনিনদের নেতৃত্বে কাজ করতে হবে যারা একদিন আমাদের ছয় দফার ঘোর বিরোধীতা করেছিলেন। তো প্রচার সম্পাদকরা কতটুকু প্রচার করছেন বর্তমান সরকারের সাকসেস এবং এ্যাচিভমেন্টের কথা? মাননীয় তথ্যমন্ত্রী কতটুকু স্বার্থকভাবে তথ্য প্রচারের কাজে নিয়োজিত আছেন বর্তমান সরকারের সাকসেস এবং এ্যাচিভমেন্টের খতিয়ান দিতে? কেবল তো টিভি ইন্টারনেটে দেখি তাঁর একটাই কাজ বিরোধী দলের নেত্রী এবং তাঁর গুষ্টি উদ্ধার করা। সংসদেও তাঁর যেন ওই একই কাজ। হাইকমান্ডকে ক্রমশঃ গ্রাস করে ফেলছে এই বামেরা আর তাঁর দলের লোকজন কেবল দুর থেকে হাইকমান্ডের মুখ-মন রক্ষার্থে বলে চলেছেন - "দেখতে খারাপ হলেও খেতে ভালো"। বঙ্গবন্ধুর চারপাশে যখন এই বামেরা ঘুর ঘুর করে পরামর্শ দিয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু সে সব শুনেছেন তখনই তাঁর সর্বনাশের ঘন্টা বাজতে শুরু করেছিলো। শুধু বাকশাল সৃষ্টির পটভূমির কথা মনে করলেই চলবে।

হাতির ঝিল, ফ্লাইওভার, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, বয়স্ক ভাতা, গ্রামে-গঞ্জে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করলেই শুধু চলবে না - তাতেই কেবল ভোট আসবে না। যে মানুষটি ভোটেরদিন সকালে যে রাস্তা দিয়ে ভোট দিতে যাবে সে তখন দেখতে চাইবে রাস্তাটি খানা খন্দক পানিতে ডোবা না হাঁটা চলায় নিরাপদ। তার চুলায় রান্নার জন্য গ্যাস আছে কী নেই। থাকে কী ঘরে তার বিজলী? সে কী তিন বেলা পেট ভরে খেতে পারে? সে কী ঘুষ আর চাঁদাপ্রদানহীন জীবন কাটাতে পারে? সে কী নিরাপদে রাস্তা ঘাটে চলতে পারে? - না টেন্ডারবাজীতে সোনার ছেলেদের গোলাগুলিতে রাস্তায় ঢলে পড়ে?

সময় এখনো আছে। হতাশের কিছু নেই। এখন কামড়াকামড়ি বাদ রেখে মনযোগ দিতে হবে দলে। দেশজুড়ে দলের বিরোধ বিভক্তি দূর করতে হবে। সিটি করপোরেশনে হারার সেটাই অনেকে বলেন মূল কারণ। পরীক্ষিত উপেক্ষিত নেতা কর্মীদের বামব্যুহ ভেদ করে কাছে এনে দায়িত্ব দিতে হবে। দলের পুরোনো হেভিওয়েটদের নিয়ে কাজ করতে হবে। কে সংস্কার আর কে কু-সংস্কার সে হিসেবনিকেশের সময় আর নেই। এরাই দলকে জেতাতে পারবে - বামেরা নয়। তারা যদি পারতোই তবে তাদেরকে আর নৌকার টিকেট কাটতে হতো না। একাই পারতো। দীর্ঘ সাড়ে চার বছরে অনেক অর্জন যা সঠিকভাবে মানুষকে জানানো হয়নি। রানা প্লাজা ধ্বসের পর এর প্রশংসনীয় উদ্ধার কাজ ভোটাররা দেখেছে। দেখেছে কীভাবে বড় বড় প্রাকৃতিক ঝড় তুফান সুশৃংখলভাবে সামাল দেয়া হয়েছে। ভোটাররাই এর প্রশংসা করেছে। প্রশংসা করেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্দ্যোগ।

অনতিবিলম্বে এর রায় কার্যকরের ব্যবস্থা করতে হবে। জামাত-হেফাজতের সাথে কোন ধরণের আপোষ মানুষ সহ্য করবে না এবং -দিবালোকের মত সত্য - কোন আপোষ সমঝোতা হলেও কোনদিন এরা ১৪ দলীয় দলকে ভোট দেবে না, দিতে পারে না। তবে কীসের জন্য আপোস? বরং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি যারা তাদের সাথে বিভেদ বিভক্তি মান অভিমান সবকিছু ভুলে গিয়ে এক হয়ে লড়তে হবে আগামী নির্বাচন যুদ্ধে। এ যুদ্ধে কোনভাবেই হেরে যাওয়া যাবে না।

যদি ১৪ দলীয় জোট ক্ষমতায় ফিরতে না পারে তবে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ তো হবেই এবং কোন রায়ই আর কার্যকর হবে না বরং তখন ওদের গাড়ীতে আবার পতপত করবে আমার পতাকা। জামাত-হেফাজতীদের তান্ডবে হিন্দু বৌদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ হবে চরম নির্যাতনের শিকার। মনে হবে এ দেশ আমার নয়। এ স্বাধীনতাও যেন আমার নয়। মৌলবাদীদের হাতে ছিনতাই হয়ে যাবে দেশ। স্বাধীনতাও। সময়ও কিন্তু বেশী নেই।